মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে মা ও শিক্ষকদের সচেতনতা দরকার

ইকবাল মাসুদ
পরিচালক, হেলথ ও ওয়াশ সেক্টর, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে দেশের মানুষের মাঝে এখনো রয়েছে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অবহেলা। কেউ মানসিক সমস্যায় পতিত হলে চিকিৎসা নিতে অনীহা দেখা দেয় সামাজিক কারণে। আবার চিকিৎসা সেবারও রয়েছে কিছুটা অপ্রতুলতা। কোভিড পরবর্তী সময়ে মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা নতুন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্প্রতি বেড়েছে আত্মহত্যার মতো মারাত্মক দুর্ঘটনা। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় কী হতে পারে? বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সচেতনতা, অপ্রতুলতা, সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের ঘাটতি, প্রয়োজনীয়তাসহ নানান বিষয়ে মনের খবর কথা বলেছে দেশের অন্যতম বৃহৎ কল্যাণ সংস্থা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন'র হেলথ ও ওয়াশ সেক্টরের পরিচালক **ইকবাল মাসুদ**-এর সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, মনের খবর'র সহ-সম্পাদক **শাহনূর শাহীন**।

মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু?

প্রথমত বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি এখনো জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছেনি। এটার যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে অনুযায়ী সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত বা জাতীয় পর্যায়ে কোনো উদ্যোগ আমরা দেখি না। ডেফিনেটলি মানসিক স্বাস্থ্য নীতি হয়েছে, এনআইএমএইচ কাজ করছে, বিভিন্ন এনজিও, সংস্থা কাজ করছে কিন্তু বড়ো আকারে মানুষকে নাড়া দেয়ার মতো কোনো কিছু হয়নি। এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাইবো, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি আগে থেকেই একটা বড়ো ইস্যু ছিল, কিন্তু কোভিডের পর সেটা আরো প্রকট আকারে দেখা দিয়েছে। আমরা সবাই জানি মানুষ এখন অনেক বেশি স্ট্রেসফুল, মেন্টালি ডিপ্রেশ থাকা, অন্যান্য চাপ মোকাবেলা করার ইফেক্ট কাজ করে। বিশেষ করে স্টুডেন্টদের মধ্যে, প্যারেন্টসদের মধ্যে। বিনিয়োগ কথাটা তো বাণিজ্যিক। আসলে দরকার উদ্যোগ, ডোনেশন। এক্ষেত্রে সরকারের প্রকল্প গ্রহণ, অর্থ বরাদ্দ করা, যেসব বেসরকারি সংগঠন বা এনজিও আছে তাদেরও বড়ো আকারে উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি। এই উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমাদের অর্থের প্রয়োজন হয়। সেই অর্থের জোগান দেওয়ার জন্যও আলাদা উদ্যোগ দরকার। সরকারের তো সক্ষমতা আছে, টাকা বরাদ্দ রাখতে পারে। বিশেষ করে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় উদ্যোগ নিতে পারে। অন্য মন্ত্রণালয়গুলোও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রকল্প তাদের এজেন্ডায় রাখতে পারে। কেননা, মানসিক স্বাস্থ্য যে শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়েরই দেখার বিষয় তা নয়। অন্যান্য মন্ত্রণালয়েরও এক্ষেত্রে কাজ করার অনেক সুযোগ এবং প্রয়োজন আছে। বিশেষত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, শিক্ষামন্ত্রণালয়, শিশু ও নারী কল্যাণ মন্ত্রণালয় মানসিক স্বাস্থ উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ করতে পারে।

কোন কোন খাতে বিনিয়োগ প্রয়োজন বলে মনে করেন?

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যে ভাবনার একটা বিষয় আছে সেই ব্যাপারটাই এখনো মানুষের কানে পৌঁছেনি। বিষয়টা নিয়ে মানুষ এখনো সচেতন না। কোনো একটা বাচ্চা ছেলে বা মেয়ে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সাফার করছে বাবা-মা কিন্তু সেটা বুঝতে পারে না। অথবা একজন শিক্ষার্থী মানসিকভাবে চাপে আছে শিক্ষক সেটা বুঝতে পারছেন না যে, তার স্টুডেন্ট মানসিকভাবে সমস্যায় আছে। এইজন্য আমরা মনে করি একটা মা'র অ্যাওয়ার্নেস দরকার, শিক্ষকদের অ্যাওয়ার্নেস দরকার। পাশাপাশি সক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করেন বা করবেন তাদের প্রশিক্ষণ দরকার। আপনারা জানেন, এই সেক্টরে যারা কাজ করেন তারা সংখ্যায় খুব কম। সাইকিয়াট্রিস্টস বলেন, সাইকোলজিস্ট বলেন, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট বলেন, জেনারেল এডুকেশনাল সাইকোলজিস্ট বলেন সব মিলিয়ে সংখ্যা কিন্তু খুব কম। এই সংখ্যাটা বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। পাশাপাশি অন্য দেশগুলোতে যেটা করে, কমিউনিটি পর্যায়ে মেন্টাল হেলথ ওয়ার্কার তৈরি করে। মানসিকভাবে কেউ যদি সমস্যায় থাকে তারা প্রাথমিকভাবে সেটা চিহ্নিত করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করে। আমাদের দেশে এই জায়গাগুলোতে কাজ করার বড়ো সুযোগ আছে।

আহ্ছানিয়া মিশনের বিশেষ কোনো উদ্যোগ আছে কিনা?

প্রথমত আরো প্রায় ছ'বছর আগে আমরা মনোযত্ন কেন্দ্র নামে একটা মেন্টাল হেলথ কেয়ার প্রতিষ্ঠা করেছি। যেখান থেকে আমরা আউটডোর কাউন্সেলিং দেই। ২০২০ সালে আমরা গাজীপুরে 'আহ্ছানিয়া হেনা আহমেদ মনোযত্ন কেন্দ্র' নামে ৩০ বেডের একটা মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদকাসক্তি চিকিৎসার কেন্দ্র স্টাবলিশড করেছি। আমরা মনে করেছি যে, স্বাস্থ্যখাতের এই জায়গাটা একটা বড়ো জায়গা। আমি আরো একটা বিষয় স্মরণ করছি, প্রায় বিশ বছর আগে ঢাকায় আহ্ছানিয়া মিশন একটা কাজ করেছিল। ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাহমুদুর রহমান স্যার ছিলেন। উনি তখন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান ছিলেন। ওই প্রকল্পটা ছিল যেসব নারী এবং শিশুরা পাচার হয়ে যায় এবং পরবর্তিতে যারা উদ্ধার হয় বা ফিরে আসে তাদের নিয়ে। পাচার হওয়া নারী ও শিশুরা ফিরে আসলেও তারা কিন্তু মানসিকভাবে একটা স্ট্রেস বয়ে বেড়াত। সবারই একটা ট্রমা থেকে যেত। তাদের কাউন্সেলিংয়ের জন্য আমরা ৩টি বই করেছিলাম প্রায় ২০ বছর আগে। এটা ছিল ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের একটা যৌথ প্রকল্প। এটার বাইরে আমরা জার্মান সরকারের সাথে বর্তমানে একটা প্রকল্পে কাজ করছি। করোনাকালীন সময়ে আমরা প্রায় ৭শ সরকারি কর্মকর্তাকে ট্রেনিং দিয়েছি। যেমন দু'শোর মতো বিচারককে ট্রেনিং দিয়েছি। তারপর চাইল্ড সেন্টারগুলোতে যারা কেয়ারা গিভার আছে তাদেরকে মেন্টাল হেলথের বেসিক ট্রেনিং দিয়েছি। কারা অধিদপ্তরে জেলখানার ভেতরে যেসব কারা কর্মকর্তা আছেন, যারা কয়েদিদের সাথে কাজ করেন তাদেরকেও ট্রেনিং দিয়েছি। করোনাকালীন সময়ে আমরা দুইটা মডিউল করেছি। সেই মডিউলগুলো যারা আমাদের বিভিন্ন ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়েছে সবাইকে দিয়েছি। এখন যে কাজটা করছি

আমরা, সেটা হলো কিছু অ্যাওয়ার্নেস ম্যাটারিয়ালস তৈরি করা। এই যে এতো সুইসাইড হচ্ছে, কেন মানুষ সুইসাইড করে এটা তো মানসিক স্বাস্থ্যের একটা অংশ। এটা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা একটা ম্যাটারিয়ালস তৈরি করছি। তারপর স্ট্রেস দূর করার জন্য মডিউল করছি, স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য করছি। আমরা চেষ্টা করছি যেন সর্বোচ্চসংখ্যক মানুষকে এগুলো দিতে পারি। রিসেন্টলি আমরা আরেকটা কাজ করেছি। সেটা হলো, নৌবাহিনীর যে স্কুল আছে–নেভি এ্যাংকরেজ স্কুল; সেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীদেরকে আমরা তিনদিনের ট্রেনিং দিয়েছি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। নেক্সট মাসে (চলতি অক্টোবরে) শুরু হবে গ্রীন হেরাল্ড স্কুলের সাথে। এখানেও শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদেরকে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর ট্রেনিং দিব। পাশাপাশি আরো একটা রিকোয়েস্ট আমাদের কাছে এসেছে, বিমানবাহিনীর যে স্কুল আছে; তারাও আমাদেরকে অনুরোধ করেছে ট্রেনিং ক্যাম্প করার জন্য। আমাদের এই প্রকল্পটা কিন্তু অনগোয়িং। এখানে আমাদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ নিজস্ব অর্থায়ন। এমনিতেই কিন্তু আমাদের দেশে এখন বিদেশি অনুদান কমে যাচ্ছে। তারপরও আমরা চেষ্টা করছি বাইরের যদি কোনো সহযোগিতা পাওয়া যায় তাহলে আরো ভালো কাজ করা যাবে। অর্থের যদি ঘাটতি না থাকে তাহলে আরো বড়ো আকারে পরিকল্পিতভাবে কাজগুলো করা যায়।

বিদেশি বিনিয়োগ বা ডোনেশনের সম্ভাবনা কেমন?

এটা ডোনারের প্রয়োরেটি থাকে। বর্তমানে মেন্টাল হেলথ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কনসার্ন। বিশেষ করে কোভিড পরবর্তী এই পরিস্থিতিতে সবাই মানসিক স্বাস্থের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপে নতুন করে ভাবছে। কোভিড-১৯ দেখিয়ে দিয়েছে মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেয়া কতটা জরুরি। আমার মনে হয় এখন ডোনাররা চিন্তা করছে। আমি অনেকগুলো প্রজেক্টে দেখেছি তারা এখন নতুন করে মেন্টাল হেলথের কোনো প্রজেক্ট রাখছে না বরং আলাদা অনুষঙ্গ করে নিয়েছে। মানসিক স্বাস্থ্য উন্নতিতে আবশ্যিক চলমান ইস্যু করে নিয়েছে তারা। আমি মনে করি এখানে ভালো একটা সম্ভাবনা আছে। দাতা সংস্থাগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা এবং ফান্ডিং নিয়ে আসার সুযোগ আছে।

আপনি নিশ্চয় জানেন, গেল মাসে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টস আন্তর্জাতিক মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে বড়ো ধরনের একটা আয়োজন করেছে। দুইদিনব্যাপী কনফারেন্স ছিল। দেশের মানসিক স্বাস্থ্যখাতে সেটার কতটা প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন?

এটার একটা ইমপেক্ট পড়তে পারে। কিন্তু বিষয়টা হলো আয়োজকরা কীভাবে এটাকে ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনালি ছড়িয়ে দিবে। কতটুকু পৌঁছাতে পারবে সেটাও একটা ব্যাপার। বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এত বড়ো ইভেন্ট হচ্ছে (হয়েছে) এটার আসলে বড়ো প্রোপাগান্ডা দরকার। ক্যাম্পেইন দরকার। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর থাকা দরকার। এছাড়াও অনেক মিনিস্টার যাবে, মিডিয়া যাবে। তারা দেখাবে বাংলাদেশে এত বড়ো একটা কাজ হচ্ছে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বিশেষজ্ঞরা আসছেন আমাদের দেশে। এটার যে, রিকমেন্ডেশন বা ডিক্লেয়ারেশন থাকবে সেটার ইন্টান্যাশনালি প্রচার করা, পলিসি মেকার আছে যারা তাদের মাধ্যমে সেগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া। আমি মনে করি এটা একটা বিরাট সুযোগ ছিল। বাইরের দেশের অনেক মনোবিজ্ঞানীরা এসেছেন, যারা অনেকে বিশ্বব্যাপী মানসিক স্বাস্থ্যখাতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এসেছেন এটা আমাদের জন্য একটা বড়ো অপরচুনিটি। যারা আয়োজক আছেন, আমার বিশ্বাস তারা যদি এটা সবার নজরে আনতে পারেন তাহলে এর একটা বড়ো প্রভাব পড়বে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্য খাতে। ধরুন, একটা হোটেলে কনফারেন্স করলাম সেটা যারা উপস্থিত ছিল তারাই জানল বাহিরের মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারলাম না তাহলে কিন্তু এটার পুরোপুরি সুফল আমরা পাবো না। এজন্য এটার সর্বোচ্চ প্রচার-প্রসারণায় গুরুত্ব দেয়া দরকার।

এবারের কনফারেন্সে দুটি প্রধান মানসিক রোগ ড্রিপেশন এবং অ্যাংজাইটি ডিজঅর্ডারের চিকিৎসা নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে বিএপি। এনিয়ে বিএপি পাঁচটি প্রধান মানসিক রোগের গাইডলাইন প্রকাশ করল। এ নিয়ে আপনার মূল্যায়ন কী?

একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, যে পাবলিকেশনগুলো ওখানে হচ্ছে সেগুলো কিন্তু একাডেমিক। এটা যারা সাইকিয়াট্রিস্টস আছেন তারা ফলো করবেন। এটার ভীষণ দরকার আছে। এতে চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্টান্ডার্ড মান আসবে। তবে আমরা যখন আমি কমিউনিটিতে যাব, নন টেকনিক্যাল মানুষের কাছে যাব তারা কিন্তু এটা বুঝবে না। আমাদের যেটা হয়, নির্দেশিকাগুলো এক্সপার্টদের কাছেই থেকে যায়। এটাকে আর কাস্টমাইজড করা হয় না। যার কারণে এটার সুফল বা

ব্যবহার খুব কম। সুতরাং আমি মনে করি, এই গাইডলাইনগুলোকে পুনরায় আরো সহজবোধ্য করে, সহজ ভাষায় কাস্টমাইজ করে মানুষের কাছে পৌছানোর একটা সুযোগ আছে। আমরা আহ্ছানিয়া মিশনের পক্ষে যেটা করেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বা জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাথে আমাদের অলয়েজ কমিউনিকেশন আছে। তাদের সাথে আমরা যে কাজগুলো করি, আমাদের যে পাবলিকেশনগুলো থাকে সেগুলোকে সহজ করে মানুষের কাছে উপস্থান করি। যাতে করে ননএক্সপার্ট মানুষগুলোও মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে জানাতে পারে।

বাংলাদেশে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র বৃহৎ সংগঠন বিএপি। তো, বিএপির সাথে আপনাদের সমন্বিত কোনো উদ্যোগ বা পরিকল্পনা আছে কিনা।

আমি আগেই বলেছি আমরা কিন্তু একসাথেই কাজ করি। নাসিরুল্লাহ সাইকোথেরাপি ইউনিট, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বা জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সাথে আমরা যৌথভাবে অনেক কাজ করি। যেমন ধরুন জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটে যারা কর্মরত আছেন বা ছিলেন তারা অধিকাংশই কিন্তু বিএপির সাথে সম্পৃক্ত। ঘুরেফিরে আমরা কোনো না কোনো এক জায়গায় মিলিত হই। আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ এবং পরিকল্পনা আছে। সেভাবেই আমরা কাজগুলো করছি। তারা কখনো কখনো আমাদেরকে ডাকেন আবার আমরাও কিন্তু তাদেরকে ডাকি। যেমন, সম্প্রতি যে 'ইন্টারন্যাশনাল রিকভারি ডে' ছিল সেখানে আমাদের কিন্তু উদ্যোগ ছিল। আমাদের চিফগেস্ট ছিলেন, এনআইএমএইচ'র যিনি পরিচালক ডা. বিধান রঞ্জন স্যার, মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের সাইকিয়াট্রিস্টস ডা. রাহেনুল ইসলাম আমাদের মূল বক্তা ছিলেন। আবার উনারাও কিন্তু কখনো কখনো উনাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকেও ডাকেন। আমি মনে করি এই জায়গাগুলোতে আমাদের সমন্বিত উদ্যোগ এবং অংশগ্রহণমূলক কাজ দরকার। আমার মনে হয় আমাদের মাঝে সেটা আছে।

বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্টদের প্রতি বিশেষ কোনো পরামর্শ যদি থাকে...

বিশেষ পরামর্শ বলতে, এখনো পর্যন্ত আমাদের নীতি নির্ধারক যারা আছেন তাদের বিবেচনায় কিন্তু মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টা খুব বেশি গুরুত্বের সাথে নেই। যতটুকু চিন্তা করেন, সেটা সাইকিয়াট্রিস্টসরা করেন, সাইকোলজিস্টরা করেন বা কাউন্সিলররা। এই যে, যেই কথাগুলো হচ্ছে, উনারা যে প্রচারণা চালাচ্ছেন, আমার মনে হয় নীতি নির্ধারণের ওই লেভেলে একটা গভীর যোগাযোগ দরকার। যারা এটাকে ন্যাশনাল ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিবে। অলরেডি হচ্ছে। আমাদের এসডিজি লক্ষ্যমাত্রায় সেটা আছে। মানসিক স্বাস্থ্য অ্যাক্ট হয়েছে। সরকারকে বিষয়গুলো ধরিয়ে দিলে কিন্তু সরকার সেটা বাস্তবায়ন করবে। এটাকে যদি শুধু স্বাস্থ্য ইস্যু ভাবা হয় তাহলে কিন্তু এটা সংকীর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা যদি এটাকে মাল্টি সেক্টরাল ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে পারি নীতি নির্ধারকদের কাছে তাহলে অনেক মিনিস্ট্রি এখানে ইনভলব হতে পারবে এবং তারা তাদের মতো কাজ করতে পারবে। তাহলে বিষয়টা অতি দ্রুত অনেক মানুষের কাছে পৌছবে। এজন্য আগে যেটা বলেছি, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়, শিক্ষামন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণায়ল, ধর্ম মন্ত্রণালয়সহ আরো যারা আছে সবাইকে যদি একজায়গায় করতে পারি তাহলে সেটার ভালো ইফেক্ট পড়বে। স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় একা যতটুকু করতে পারবে, সমন্বিত উদ্যোগ হলে তারথেকে অনেক বেশি কাজ করা যাবে। এজন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয়কেই এই উদ্যোগটা নিতে হবে। তাছাড়া স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় যেটা আছে, তারা কিন্তু সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে নানা কাজ করছে। এমনকি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনেও সারাদেশে স্বাস্থ্যক্লিনিক আছে সেখানেও মানসিক স্বাস্থ্য ইস্যু জোরালোভাবে তুলে ধরা যেতে পারে। আমার মনে হয়, আমরা যদি সরকারকে বিষয়গুলো তুলে ধরতে পারি তাহলে এটার একটা ফল পাওয়া যাবে।

ধন্যবাদ, স্যার আমাদেরকে সময় দেয়ার জন্য।

আপনাকেও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মনের খবরকেও।